সূচিপত্র

কৈশোরের সান্নিধ্যে **৯**

কৈশোরের বৈশিষ্ট্যগত ভিন্নতা ১০

বয়ঃসন্ধিকাল কেন জীবনের সংকটময় পর্যায়? ১১

কৈশোরের সংশয় ১২

কৈশোরের অতি আদর্শবাদিতা ১২

কিশোর কেবল একজন কিশোরই ১৫

‘আমিই ঠিক’ মানসিকতা ১৬

সমবয়সিদের সাথে যোগসাজশ ১৭

চেতনার সংঘাত ২০

কিশোরের স্বপ্ন ২৫

বাবা-মায়ের সাথে কিশোরদের সম্পর্ক **২৮**

সম্পর্কের টানাপোড়েন ২৯

মতবিনিময়ের জন্য সময় নির্ধারণ ৩০

পারস্পরিক সম্মানবোধ ৩২

কিশোরদের ওপর কর্তৃত্ব খাটাবেন না ৩৩

কোনো জবরদস্তি নয়! ৩৫

উন্মত্ত ক্রোধের লাগাম ৩৭

সন্তানের জন্য সুস্থ বিনোদন ৩৯

পারস্পরিক আস্থার সম্পর্ক ৪১

সন্তানের বন্ধুদের সাথে অমায়িক আচরণ ৪৪

সম্পর্ক হোক দ্বীনের জন্য ৪৬

কিশোরদের দিকনির্দেশনা **৪৮**

উপদেশের চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ যা ৪৯

শোনা : যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম ৫০
আত্মার খাদ্য : উৎসাহ ৫৩
কিশোরমনে নৈতিকতার গাঁথুনি ৫৫
জানতে হবে নিজেকে ৫৭
শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের বিকল্প নেই ৫৯

কিশোরদের কীভাবে সাহায্য করবেন? ৬২
কিশোরদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ৬৩
বুলিং থেকে রক্ষা করুন ৬৪
ইন্টারনেটের ভয়াল থাবা ৬৬
কিশোরকে অসৎসঙ্গ থেকে দূরে রাখা ৬৮
কিশোরদের অসৎসঙ্গ থেকে দূরে রাখা ৭০
নৈতিক অধঃপতন ৭৩

সমস্যার সমাধান ৭৬
কিশোরদের অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ ও বাড়াবাড়ি ৭৭
যেমন হতে হবে কিশোরদের প্রতি আচরণ ৭৮
পড়াশোনায় সাফল্য না এলে ৮১
কৈশোরের উগ্রতা ও সংশয় ৮৫
কিশোরদের দায়িত্ববোধের অভাব ৮৯
কিশোরীদের সরলতা ৯৩
যুবকরা যেভাবে মেয়েদের পটায় ৯৪
জেগে ওঠো, হে ঘুমন্ত কিশোরী! ৯৬
শেষকথা ১০০

প্রথম অধ্যায়

কৈশোরের সান্নিধ্যে

কৈশোর মানবজীবনের এমন একটি পর্যায়, যা শৈশবকাল নয়, আবার যৌবনকালও নয়। পর্যায় বলার কারণ, কৈশোর কোনো স্থায়ী অবস্থার নাম নয়, এটি কেবল একটি সাময়িক অবস্থা।

কিশোরকালের সময়টা একটু পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, বড়দের ব্যাপারে কিশোরদের অভিযোগ হলো, বড়রা তাদের একদমই বুঝতে চায় না, তাদের প্রাপ্য অধিকারও আদায় করে না।

অপরদিকে, বাবা-মায়েদের দৃষ্টিতে কিশোরদের বেশিরভাগ আচরণই বেপরোয়া আর খ্যাপাটে। তারা এত অনর্থ সৃষ্টি করে, অনেক সময় তাদের কাজ পরিবারের সম্মানহানির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সুতরাং এখানে আমাদের দুটো দিকই মাথায় রাখতে হবে—অভিযোগ ও পালটা-অভিযোগ। আসলে সমস্যা কোনোদিক থেকেই কম নয়। বাবা-মায়েরা কিশোরদের বয়ঃসন্ধিকালের সময়টিকে বুঝে চলেন না। এমনকি এ সময় তাদের মাঝে হঠাৎ করে আসা ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনগুলোও বোঝার চেষ্টা করেন না।

বাবা-মায়েরা যদি কৈশোরের প্রকৃতি ও বিশেষত্বগুলো জানার জন্য কিছুটা সময় ব্যয় করেন, তাহলে কিশোর সন্তানদের সাথে বোঝাপড়ার বিষয়টি তুলনামূলক

সহজ হবে। আলাপ-আলোচনা জমাতেও খুব বেশি বেগ পেতে হবে না। এছাড়াও বাবা-মায়েরা পরিণত দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতিগুলো মোকাবিলা করতে পারবেন। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো তাদের দেওয়া পরামর্শগুলো ছেলেমেয়েদের চিন্তাধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে; ছেলেমেয়েরাও সেগুলো সহজে বুঝতে পারবে।

কিশোরদের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একই রকম। নিজেদের সম্পর্কে জানলে তারাও সংকীর্ণতার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে শিখবে। নিজেরা যে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তা সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকলে পরিবারের সবার সাথে আলোচনায় খোলাখুলিভাবে অংশ নিতে পারবে।

একটি বাস্তবতা হচ্ছে, 'তুমি যদি নিজেকে বোঝো, তবে অন্যকেও নিজের সম্পর্কে বোঝাতে পারবে। বয়ঃসন্ধিকালের সত্য এটাই যে, এই পর্যায়ে উপনীত কিশোরেরা নিজেদের সম্পর্কে যত বেশি জানবে, তত ভালোভাবে পরিবারের মানুষগুলোর সাথে মিশতে পারবে। পাশাপাশি প্রবীণদের পরামর্শগুলোরও মূল্যায়ন করতে পারবে।'

এ ব্যাপারে পরিষ্কার ধারণা পেতে কৈশোর নিয়ে গবেষকদের প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণের আলোচনা প্রয়োজন।

কৈশোরের বৈশিষ্ট্যগত ভিন্নতা

প্রতিটি কিশোর পরিবার ও সমাজের একজন সদস্য; হতে পারে সে ছাত্র অথবা কর্মজীবী। তাই সব কিশোরের আচরণের অভিব্যক্তি ও পরিণতি একরকম হয় না। যে কিশোর একটি সচেতন পরিবার ও ভালো বন্ধুদের সাহচর্যে বড় হওয়ার সুযোগ পায়, সে অনেকটা নির্ঝঞ্ঝাটে তার কৈশোর অতিক্রম করে ফেলে। এজন্য অনেক কিশোরকে দেখা যায়, তারা তাদের পরিবারের সাথে বেশ সুন্দরভাবেই মানিয়ে নিচ্ছে, শিক্ষাঙ্গানে ভালো ফলাফল করছে, ধর্মপালনেও তারা নিষ্ঠাবান।

কিন্তু এই বিষয়টি সম্পূর্ণ বদলে যেতে পারে, যদি পরিবারের বাবা-মায়ের কেউ একজন ভীষণ সন্দেহপ্রবণ, একরোখা ও খুঁতখুঁতে হন। অপরদিকে, অপরাধ জগতের কারো সাহচর্যে থাকা একজন কিশোরের অবস্থাও ভিন্ন। কারণ সেই মানুষটা প্রতিনিয়ত তাকে অবাধ্যতা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও অপরাধ প্রবণতার দিকে প্রলুব্ধ করতে পারে।

এই আলোচনা থেকে আমরা দুইটি সিদ্ধান্তে আসতে পারি—

প্রথমত, এই সময়টি নির্বিঘ্নে ও সফলভাবে পার করার ক্ষেত্রে একজন কিশোরের ওপর তার পরিবার বড় একটি ভূমিকা রাখে।

দ্বিতীয়ত, কিশোরেরা পরিবারের বড়দের দায়িত্বে অবহেলার শিকার হতে পারে। আবার এমনও হতে পারে, তার চারপাশ, যেমন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা কর্মস্থলের পরিবেশ তার যথাযথ বেড়ে ওঠার উপযোগী নয়, বরং অন্তরায়।

যে দিক থেকেই বিবেচনা করা হোক না কেন, একজন কিশোর যেসব সমস্যার মুখোমুখি হয়, অথবা নিজে যেসব সমস্যার সৃষ্টি করে—এ সবকিছুর দায়ভার কেবল তার একার নয়; এই দায়ভার অনেকাংশে পরিবারের প্রাপ্তবয়স্কদের ওপরও বর্তায়।

বয়ঃসন্ধিকাল কেন জীবনের সংকটময় পর্যায়?

কৈশোর মানবজীবনের একটি অবস্থান্তর সময়। আর এই সময়ের বিশেষত্বই হলো অবাধ্যতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা। মনে রাখতে হবে, এ সময় প্রতিটি কিশোর তার শৈশবের বিধিনিষেধ, ধ্যানধারণা ও আচার-আচরণ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য নিজের সাথে আপ্রাণ যুদ্ধ করে চলে। আরো কয়েক বছর পর, ষোলো কিংবা সতেরোর দিকে এসে কৈশোরের বিভিন্ন অনিশ্চয়তা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টায় সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, খুঁজতে থাকে একটি সুন্দর জীবনের পথ।

কৈশোর নিয়ে বেশকিছু গবেষণায় দুটো ধারণা পাওয়া যায়—

এক. এই সময়ে ছেলেমেয়েদের হরমোন গ্রন্থি থেকে প্রচুর হরমোন নিঃসরিত হয়। এগুলোই ছেলেদের ভেতর জন্ম দেয় রাগক্রোধ, বিরক্তি, খিটখিটে মেজাজ আর মেয়েদের মধ্যে ক্রোধ, হতাশা ও অকারণ বিষণ্নতা।

দুই. এই সময়ে স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশ ঘটে। গবেষণায় দেখা গেছে, যুক্তি-বুদ্ধি নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রের চেয়ে মস্তিষ্কের আবেগ নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র দ্রুতগতিতে বিকশিত হয়।

ফলে এ বয়সে তারা চিন্তাভাবনায় বেশ ত্বরাপ্রবণ ও অদূরদর্শী হয়ে থাকে। মানসিক সমস্যাগুলো এ বয়সে বেশি চোখ পড়ে। এসব শারীরিক পরিবর্তনের পেছনে যেহেতু কিশোরদের কোনো হাত নেই, তাই এগুলো নিয়ে তাদের দোষারোপ করা থেকে

বিরত থাকাই ভালো। সেই সাথে এই কঠিন সময়টি তারা যেন সহজে পার হয়ে যেতে পারে, সেজন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া উচিত।

কৈশোরের সংশয়

দ্বিধা-সংশয় ও অনিশ্চয়তা হচ্ছে বয়ঃসন্ধিকালীন মানসিক অবস্থার দুটো দৃশ্যমান বৈশিষ্ট্য। কিশোররা হঠাৎ করেই নিজেদেরকে বড়দের জগতে আবিষ্কার করে; বিষয়টা তাদের জন্য খুব একটা সহজ নয়। এ অবস্থায় পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে নিজেকে সুন্দরভাবে খাপ খাইয়ে নিতেও তাদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। এছাড়া মানসিক অস্থিরতা ও বয়সসুলভ অনুভূতিও তারা এড়িয়ে যেতে পারে না। কারণ তারা একটি নির্দিষ্ট পরিবেশেরই অংশ। আর সেই পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে তাদের অভিজ্ঞতা স্বাভাবিকভাবেই কম থাকে। তাই গভীর কল্পনাশক্তি ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকার পরেও তারা অনেক ক্ষেত্রে সঠিক সময়ে সঠিক পথটি চিনে নিতে পারে না।

তারা প্রত্যাশা করে, তাদের বাবা-মা কিংবা পরিবারের প্রবীণরা তাদের প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করবে। অথচ তারা নিজেরাই বেশিরভাগ সময় শিশুসুলভ আচরণ করে।

এই বিষয়টি বাবা-মায়ের জন্য বেশ বিরক্তিকর। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়, কিশোরদের এই বৈশিষ্ট্য আদতে পরিবারে কোনো ঝামেলা সৃষ্টি করে না। কিশোরটি আর আগের মতো ছোট শিশু নয়, তাই তার জন্য শিশুসুলভ আচরণ বেমানান। আবার যেহেতু সে প্রাপ্তবয়স্কও নয়, তাই বড়দের মতো পুরোপুরি সুযোগ-সুবিধাও সে পায় না। ফলে তারা এ সময় অনেকটা খামখেয়ালি ও কল্পনার সাগরে ভাসতে থাকে। একসময় তারা এও বুঝে নেয় যে, তাদের অবাধ্য স্বপ্ন-কল্পনাগুলোর পাখা মেলার সময় এখনো আসেনি।

কৈশোরের অতি আদর্শবাদিতা

কিশোর বয়সে ছেলেমেয়েদের মন খুব সরল ও নিষ্কলুষ হয়ে থাকে। তাদের সরল মননের প্রকাশ ঘটে জীবন ও জগৎ নিয়ে তাদের স্বচ্ছ চিন্তাদর্শনের মধ্য দিয়ে। তারা বিদ্যালয় থেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, মার্জিত ব্যবহার, সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা,

মিতব্যয়িতা, সঠিক ব্যবস্থাপনা—এরকম অনেক সদাচার সম্পর্কে জানতে পারে। বালকসুলভ আবেগের তাড়নায় অনেক গুণ বা আচারের সাথে তারা নিজেদের সত্তাকেও একরকম জড়িয়ে ফেলে। ফলে আশপাশের মানুষগুলোর মাঝে এসব আচরণের সামান্য নড়চড় দেখলেই তাদের চোখে সেগুলো বিরাট কিছু মনে হয়।

কয়েকটি উদাহরণ দেখা যাক—

[এক] এক কিশোর তার পরিবারের সাথে খাবার টেবিলে বসেছে। হঠাৎ তার চেহারায় প্রচণ্ড বিরক্তির রেখা ফুটে ওঠে। বাবা জিজ্ঞেস করলেন, ঘটনা কী? সে প্রথমে উত্তর দিতে চায়নি। অনেক জোরাজুরির পর জানায়, তার বড়ভাই খুব দ্রুত খায়। তাড়াহুড়ো করে খাওয়া শিষ্টাচার-বিরোধী কাজ। আর এই কাজটা তার খুবই অপছন্দের। তাই সে বিরক্ত!

[দুই] এক কিশোরী হঠাৎ দড়াম করে ঘরের দরজা লাগিয়ে কান্না জুড়ে দেয়। ঘটনা হলো, সে তার বান্ধবীর সাথে ফোনে কথা বলছিল, ঠিক তখনই তার ভাই ফোন চেয়ে বসে। কিন্তু সে ফোনটা দেবে কী করে? সে তো ফোনে কথা বলছে। আর এ কারণে ভাইটি তাকে ইচ্ছেমতো বকাঝকা করে এবং দ্রুত কথা শেষ করতে বলে। ফোনের ওপাশ থেকে বকাবকির আওয়াজ শুনে বান্ধবী কি-না-কি ভাবল! ব্যাপারটা তার কাছে খুবই অপমানজনক মনে হয়েছে। তাই সে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারেনি। মন খারাপ করে দরজা লাগিয়ে দিয়েছে।

[তিন] আরেক মেয়ের ঘটনা, সে তার মায়ের সাথে চিৎকার-চ্যাঁচামেচি করছিল। কারণ তার মা ঘরের পুরোনো পোশাক পরেই একজন অতিথিকে আপ্যায়ন করেছেন। অথচ এটা অতিথি-আপ্যায়নের আদব নয়।

[চার] একবার এক কিশোরের মোটা অঙ্কের কিছু টাকার প্রয়োজন পড়ে। সে তার বাবার কাছে টাকা চাইলে বাবা জানান, টাকাটা এই মুহূর্তে তার কাছে নেই, তবে দিন দুয়েক পর তিনি দিতে পারবেন। ছেলেটি তখন রেগে গিয়ে বাবাকে বলে, 'আমি তো সেদিনই তোমাকে বলেছিলাম, টাকাটা আমার যেকোনো সময় লাগতে পারে। তখন তুমি কেন আশ্বাস দিয়েছিলে যে, টাকাটা সময়মতো দিতে পারবে?'

সমালোচনারও একটা আদব আছে, আছে সীমা ও পরিসীমা। ফলদায়ক হওয়ার জন্য সমালোচনা কখন করতে হবে, কখন চুপ থাকতে হবে সেটা জানা জরুরি।

সমালোচনার নিয়ম না জানা থাকলে কিশোরদের অসংলগ্ন আচরণের পরিণাম বহুদূর গড়াতে পারে। বিশেষ করে নিজ পরিবারের সদস্যদের সমালোচনার ব্যাপারে সতর্ক হওয়া উচিত। কারণ তারাই আমাদের প্রতিপালন করে বড় করেছেন। তাছাড়া পরিবারের সদস্যরাই আমাদের সবচেয়ে আপনজন। বিপদে-আপদে তারাই সবার আগে এগিয়ে আসেন।

আসলে পরিবারের সদস্য কিংবা শিক্ষকদের সাথে কিশোরদের বিভিন্ন বিষয়ের মতবিরোধের অন্যতম কারণ তাদের অতি আদর্শবাদিতা ও একগুঁয়েমি। তারা একটা মতবাদের তত্ত্বীয় ও প্রায়োগিক রূপের মধ্যে তফাতটা ধরতে পারে না। ফলে অনেক কিছুই তাদের কাছে কিতাবি জ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক মনে হয়। একটি তত্ত্বীয় শব্দের ক্ষেত্রবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন প্রায়োগিক অর্থ হতে পারে—এ বিষয়ে তাদের ভালো ধারণা থাকে না। এমনকি এই ব্যাপারটাও তারা বুঝতে পারে না যে, পরিস্থিতির কারণেও একজন ব্যক্তি অন্যরকম আচরণ করতে বাধ্য হতে পারে।

কিশোরদের সাথে পরিবার ও সমাজের মতবিরোধের আরেকটি কারণ, তারা খুব দ্রুত যেকোনো ঘটনার নেতিবাচক পরিণতি আন্দাজ করে বসে। যেমন : কোনো ইন্টারভিউতে মনোনীত না হওয়া কিংবা কোনো আয়োজন যথাযথভাবে না হওয়া, অথবা কারো সাথে কর্কশভাবে কথা বলে ফেলা। সাথে সাথে তারা অনুমান করে নেয়, এর পরিণতি ভোগান্তি ছাড়া আর কিছু বয়ে আনবে না।

মূলত তারা কোনো ঘটনা সম্পর্কে বড় পরিসরে চিন্তা করতে পারে না। তাদের অভিধানে আপেক্ষিক বলতে কিছু নেই, সবকিছুই পরম। এই অতি আদর্শবাদিতার কারণে তারা কেবল অন্যদের ব্যাপারে তিক্ত ও অপরিপক্ব মন্তব্য ছুড়ে দিয়েই ক্ষান্ত হয় না, নিজেরাও অকারণ ভয় ও দুশ্চিন্তায় ভোগে। তারা নিজেদের ব্যাপারেও কঠোর মনোভাবাপন্ন হয়ে থাকে, ফলে নিজের করা কোনো ভুলের কারণে নিজেকেও ক্ষমা করতে পারে না।

মোটকথা, কিশোর বয়সের অপরিণত বুদ্ধি-বিবেচনার অন্যতম কারণ অতি আদর্শবাদিতা। তবে এটাও সত্য যে, এই আদর্শবাদিতা সবসময় নেতিবাচক নয়, অনেক ইতিবাচক দিকও রয়েছে। পরিবার ও সমাজের অনেক ভুল সংশোধনে এর ভূমিকা লক্ষণীয়। এই আদর্শবাদিতাই তাদেরকে ভালো ও মন্দের মাঝে ফারাক করতে শেখায়, কিশোরকে একজন দক্ষ ও সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

কিশোর কেবল একজন কিশোরই

আমরা কি লক্ষ করেছি, বয়স্করা এ যুগের কিশোরদের সম্পর্কে কেমন ধারণা পোষণ করে থাকেন? তাদের ধারণা অনেকটা এরকম—এ যুগের কিশোরদের তুলনায় তারা অনেক বেশি ভদ্র ছিলেন। তারা যেমন দায়িত্ব পালনে মনোযোগী ছিলেন, তেমনি পরিবারের সাথে মতবিরোধেও কম জড়াতেন।

অর্থাৎ কিশোরদের প্রতি তাদের ধারণা খুবই নেতিবাচক। যে কারণে তাদের মনে কিশোরদের ব্যাপারে নানামুখী অভিযোগ দানা বাঁধতে থাকে। আর এর ফলে তারা কিশোরদের সাথে কথাবার্তা ও আচরণে প্রয়োজনীয় ধৈর্যটুকু ধরে রাখতে ব্যর্থ হন। এজন্য বাবা-মায়েদের মনে রাখা প্রয়োজন, মূলত বড়দের কাছ থেকেই কিশোররা অসংগত ও উদ্ধত আচরণ শেখে।

কিশোরদের অসংগত ও উদ্ধত আচরণ আসলে সহজাত একটি সমস্যা। প্রত্যেক প্রজন্মেই এর পুনরাবৃত্তি ঘটে, কেবল সমস্যার প্রকৃতি ও আঙ্গিকে ভিন্নতা থাকে। কারণ আমাদের সামাজিক অবস্থাও সময়ের সাথে প্রতিনিয়ত বদলাচ্ছে।

অতীতে মানুষ ছোট ছোট গ্রামে বাস করত। বড় পরিবারের অনেকগুলো সদস্যের একসাথে থাকা, পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের পরম ভক্তিশ্রদ্ধা করা—এমনই ছিল তৎকালীন সমাজব্যবস্থার কঠোর রীতিনীতি। পরিবারের যশখ্যাতিতে কোনো কলঙ্ক না লাগুক—এ ব্যাপারে তারা এখনকার সময়ের চেয়ে অনেক বেশি সচেতন ছিল। মানুষের মাঝে ব্যক্তিস্বাধীনতার অনুভূতিও এখনকার মতো এতটা প্রবল ছিল না। আগে কখনোই মানুষের খেয়ালখুশিকে এত বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় কিশোরদের অসংগত আচরণ যে তুলনামূলকভাবে কম হবে, তা সহজেই অনুমেয়। আসলে সেখানে তাদের এ ধরনের আচরণ করার তেমন সুযোগই ছিল না। কারণ এমন পরিস্থিতিতে অন্তরে মন্দ কাজের যে বাসনা থাকে, বাইরে তার খুব কমই প্রকাশ করা সম্ভব।

এখনকার সময়ে যখনই কোনো কিশোর পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করে, অন্যায়ভাবে শিক্ষকের গায়ে হাত তোলে কিংবা রূঢ় আচরণ করে ফেলে; সাথে সাথে সেটা সংবাদমাধ্যমে এমনভাবে প্রচারিত হয়, যেন এমন অপ্রীতিকর ঘটনা কিশোরদের মাঝে মহামারির রূপ নিয়েছে। অথচ বাস্তবতা সেরকম নয়। সংবাদমাধ্যমে স্বাভাবিক ঘটনার ব্যতিক্রম খবরগুলো স্থান করে নেয়। আর

নেতিবাচক ঘটনা সবসময়ই ব্যতিক্রমধর্মী। তাই কিশোরদের নেতিবাচক কাজগুলোর খবর বেশি প্রচারিত হয়, যা দেখে মনে হতে পারে এ যুগের সব কিশোর বুঝি রসাতলে গেল!

‘আমিই ঠিক’ মানসিকতা

সৃষ্টিগতভাবে শৈশব ও যৌবনের মধ্যবর্তী সময়টুকুই কৈশোর। এ বয়সের উদ্দীপনাকে বুঝতে হলে তাকাতে হবে কিশোরদের জোরালো আত্মসম্মানবোধের দিকে। তারা মনে করে, বড়রা যেমন সম্মান পায় তাদেরও তেমনই সম্মান প্রাপ্য। তারা চায়, বিভিন্ন বিষয়ে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হোক। নিজেদের স্বাধীন মতপ্রকাশের এই প্রবল আকাঙ্ক্ষা থেকে কিশোরেরা তাদের বাবা-মা ও ভাইবোনের সাথে প্রায়শই তুচ্ছ বিষয়ে তর্কে জড়িয়ে পড়ে। খেয়াল করলে দেখা যাবে, তর্কের সময় কিশোরেরা নিজেদের মতকেই একমাত্র ঠিক এবং বিপরীতপক্ষের মতকে পুরোপুরি ভুল বলে দাঁড় করায়।

বিষয়টি একটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাক। এক কিশোর একদিন রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে ঘরে ঢুকল। তার মা রাগের কারণ জানতে চাইলেন। কিন্তু সে উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকল। অনেক জোরাজুরির পর বলল, ‘আমি মামাকে দুই-দুইবার সালাম দেওয়ার পরও তিনি উত্তর দিলেন না, এতে আমি খুবই অপমানবোধ করছি।’

রাগে গজগজ করতে থাকে সে, ‘কোনো পিচ্চি বাচ্চাও যদি সালাম দেয়, তবু তাকে সালামের জবাব দেওয়া উচিত।’

সেই কিশোরের বাবা ও মামার মধ্যে জমিজমা-সংক্রান্ত বিরোধ রয়েছে। তাই তার ধারণা, এ কারণেই মামা তার সাথে এমন অসৌজন্যমূলক আচরণ করেছেন।

মা তখন ছেলেকে বোঝাতে চেষ্টা করেন, মামা হয়তো ইচ্ছাকৃতভাবে এমনটা করেননি। হয়তো তিনি আসলে শুনতেই পাননি। কিন্তু ছেলে সেটা মানতে নারাজ। মায়ের প্রতিটি যুক্তি সে একের পর এক খণ্ডন করে চলে। উপায় না দেখে শেষে মা বললেন, ‘আমি বরং তোমার মামাকেই জিজ্ঞেস করে দেখি।’ কিন্তু তাতেও কিশোরের আপত্তি, ‘আমি নিশ্চিত, তিনি সত্যি কথাটা বলবেন না।’

যথারীতি মা তার ভাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর জানতে পারেন, তিনি ভাগ্নের সালাম তো শোনেনেই নি, এমনকি তাকে দেখেনওনি। হয়তো তখন তিনি তার সদ্য